

শকুন্তলা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শকুন্তলা



সিগনেট প্রেস ॥ কলকাতা ২৩

নবম সিগনেট সংস্করণ

জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬

প্রকাশক

দিলীপকুমার গুপ্ত

সিগনেট প্রেস

২৫।৪ একবালপুর রোড

কলকাতা ২৩

ছবি এঁকেছেন

মাখন দত্তগুপ্ত

প্রচ্ছদপট

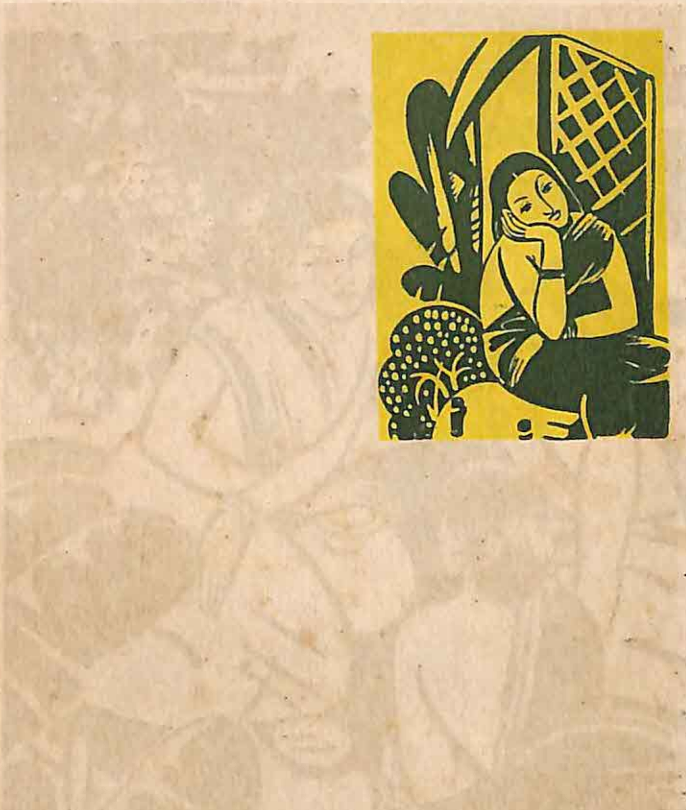
সত্যজিৎ রায়

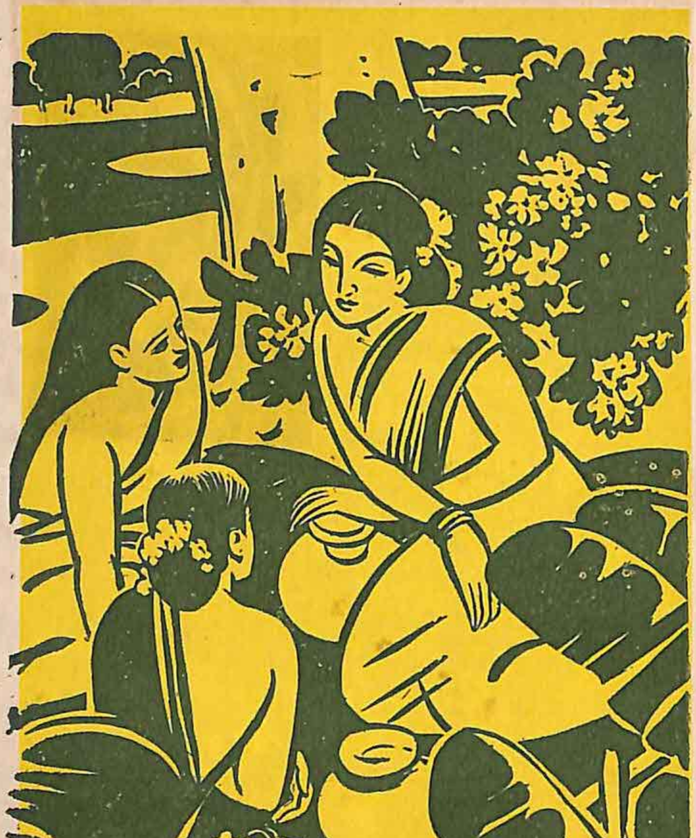
মুদ্রক

রে এণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ

৫এ ম্যাজ লেন, কলকাতা ১৬

দাম একটাকা পঁচিশ পয়সা







শকুন্তলা

এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল বড় বড় বট, সারিসারি তাল তমাল, পাহাড় পর্বত, আর ছিল—ছোট নদী মালিনী।

মালিনীর জল বড় স্থির—আয়নার মতো। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া—সকলি দেখা যেত। আর দেখা যেত গাছের তলায় কতগুলি কুটিরের ছায়া।

নদীতীরে যে নিবিড় বন ছিল তাতে অনেক জীব জন্তু ছিল। কত হাঁস, কত বক, সারাদিন খালের ধারে

বিলের জলে ঘুরে বেড়াত। কত ছোট ছোট পাখি, কত টিয়াপাখির ঝাঁক গাছের ডালে ডালে গান গাইত, কোটরে কোটরে বাসা বাঁধত। দলে দলে হরিণ, ছোট ছোট হরিণ-শিশু, কুশের বনে, ধানের খেতে, কচি ঘাসের মাঠে খেলা করত। বসন্তে কোকিল গাইত, বর্ষায় ময়ূর নাচত।

এই বনে তিন হাজার বছরের এক প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় মহর্ষি কণ্বদেবের আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমে জটা-ধারী তপস্বী কণ্ব আর মা-গৌতমী ছিলেন, তাঁদের পাতার কুটির ছিল, পরনে বাকল ছিল, গোয়াল-ভরা গাই ছিল, চঞ্চল বাছুর ছিল, আর ছিল বাকল-পরা কতগুলি ঋষিকুমার।

তারা কণ্বদেবের কাছে বেদ পড়ত, মালিনীর জলে তর্পণ করত, গাছের ফলে অতিথিসেবা করত, বনের ফুলে দেবতার অঞ্জলি দিত।

আর কি করত?

বনে বনে হোমের কাঠ কুড়িয়ে বেড়াত, কালো গাই ধলো গাই মাঠে চরাতে যেত। সবুজ মাঠ ছিল তাতে গাই-বাছুর চরে বেড়াত, বনে ছায়া ছিল তাতে রাখাল-ঋষিরা খেলে বেড়াত। তাদের ঘর গড়বার বালি ছিল, ময়ূর গড়-





বার মাটি ছিল, বেণুবাঁশের বাঁশি ছিল, বটপাতার ভেলা ছিল ; আর ছিল—খেলবার সাথী বনের হরিণ, গাছের ময়ূর ; আর ছিল—মা-গৌতমীর মুখে দেবদানবের যুদ্ধ-কথা, তাত কণ্বের মুখে মধুর সামবেদ গান।

সকলি ছিল, ছিল না কেবল—আঁধার ঘরের মাণিক—ছোট মেয়ে—শকুন্তলা। একদিন নিশুতি রাতে অপ্সরী মেনকা তার রূপের ডালি—দুধের বাছা—শকুন্তলা

মেয়েকে সেই তপোবনে ফেলে রেখে গেল। বনের পাখিরা তাকে ডানায় ঢেকে বুকে নিয়ে সারা রাত বসে রইল।

বনের পাখিদেরও দয়ামায়া আছে, কিন্তু সেই মেনকা পাষাণীর কি কিছু দয়া হল!

খুব ভোরবেলায় তপোবনের যত ঋষিকুমার বনে বনে ফল ফুল কুড়তে গিয়েছিল। তারা আমলকী বনে আমলকী, হরীতকী বনে হরীতকী, ইংলী ফলের বনে ইংলী



কুড়িয়ে নিলে ; তারপরে ফুলের বনে পূজার ফুল তুলতে তুলতে পাখিদের মাঝে ফুলের মতো সুন্দর শকুন্তলা মেয়েকে কুড়িয়ে পেলে। সবাই মিলে তাকে কোলে করে তাত কণ্বের কাছে নিয়ে এল। তখন সেই সঙ্গে বনের কত পাখি, কত হরিণ, সেই তপোবনে এসে বাসা বাঁধলে।

শকুন্তলা সেই তপোবনে, সেই বটের ছায়ায় পাতার কুটিরে, মা-গৌতমীর কোলে-পিঠে মানুষ হতে লাগল।

তারপর শকুন্তলার যখন বয়স হল তখন তাত কণ্ব পৃথিবী খুঁজে শকুন্তলার বর আনতে চলে গেলেন। শকুন্তলার হাতে তপোবনের ভার দিয়ে গেলেন।

শকুন্তলার আপনার মা-বাপ তাকে পর করলে, কিন্তু যারা পর ছিল তারা তার আপনার হল। তাত কণ্ব তার আপনার, মা-গৌতমী তার আপনার, ঋষিবালকেরা তার আপনার ভাইয়ের মতো। গোয়ালের গাইবাছুর—সে-ও তার আপনার, এমন-কি—বনের লতাপাতা তারাও তার আপনার ছিল। আর ছিল—তার বড়ই আপনার দুই প্রিয়-সখী অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা ; আর ছিল একটি মা-হারা হরিণ-শিশু—বড়ই ছোট—বড়ই চঞ্চল। তিন সখীর আজকাল অনেক কাজ— ঘরের কাজ, অতিথি-সেবার কাজ সকালে-

সন্ধ্যায় গাছে জল দেবার কাজ, সহকারে মল্লিকালতার বিয়ে দেবার কাজ ; আর শকুন্তলার দুই সখীর আর একটি কাজ ছিল—তারা প্রতিদিন মাধবীলতায় জল দিত আর ভাবত, কবে ওই মাধবীলতায় ফুল ফুটবে, সেই দিন সখী শকুন্তলার বর আসবে।

এ-ছাড়া আর কি কাজ ছিল?—হরিণশিশুর মতো নির্ভয়ে এ-বনে সে-বনে খেলা করা, ভ্রমরের মতো লতা-বিতানে গুন্-গুন্ গল্প করা, নয় তো মরালীর মতো মালিনীর হিম জলে গা ভাসানো ; আর প্রতিদিন সন্ধ্যার আঁধারে বনপথে বনদেবীর মতো তিন সখীতে ঘরে ফিরে আসা—এই কাজ।

একদিন—দক্ষিণ বাতাসে সেই কুসুমবনে দেখতে দেখতে প্রিয় মাধবীলতার সর্বাঙ্গ ফুলে ভরে উঠল। আজ সখীর বর আসবে বলে চঞ্চল হরিণীর মতো চঞ্চল অনসূয়া প্রিয়ম্বদা আরো চঞ্চল হয়ে উঠল।







দুষ্মন্ত

যে-দেশে ঋষির তপোবন ছিল, সেই দেশের রাজার নাম ছিল—দুষ্মন্ত।

সেকালে এত বড় রাজা কেউ ছিল না। তিনি পূব-দেশের রাজা, পশ্চিম-দেশের রাজা, উত্তর-দেশের রাজা, দক্ষিণ-দেশের রাজা, সব রাজার রাজা ছিলেন। সাত-সমুদ্র-তের-নদী—সব তাঁর রাজ্য। পৃথিবীর এক রাজা—রাজা দুষ্মন্ত। তাঁর কত সৈন্যসামন্ত ছিল, হাতিশালে কত হাতি ছিল, ঘোড়াশালে কত ঘোড়া ছিল, গাড়িখানায় কত সোনা রুপোর রথ ছিল, রাজমহলে কত দাস দাসী

ছিল ; দেশ জুড়ে তাঁর সুনাম ছিল, ক্রোশ জুড়ে সোনার রাজপুরী ছিল, আর ব্রাহ্মণকুমার মাধব্য সেই রাজার প্রিয় সখা ছিল।

যেদিন তপোবনে মল্লিকার ফুল ফুটল, সেই দিন সাত-সমুদ্র-তের-নদীর রাজা, রাজা দুষ্মন্ত, প্রিয়সখা মাধব্যকে বললেন—'চল বন্ধু, আজ মৃগয়ায় যাই।'

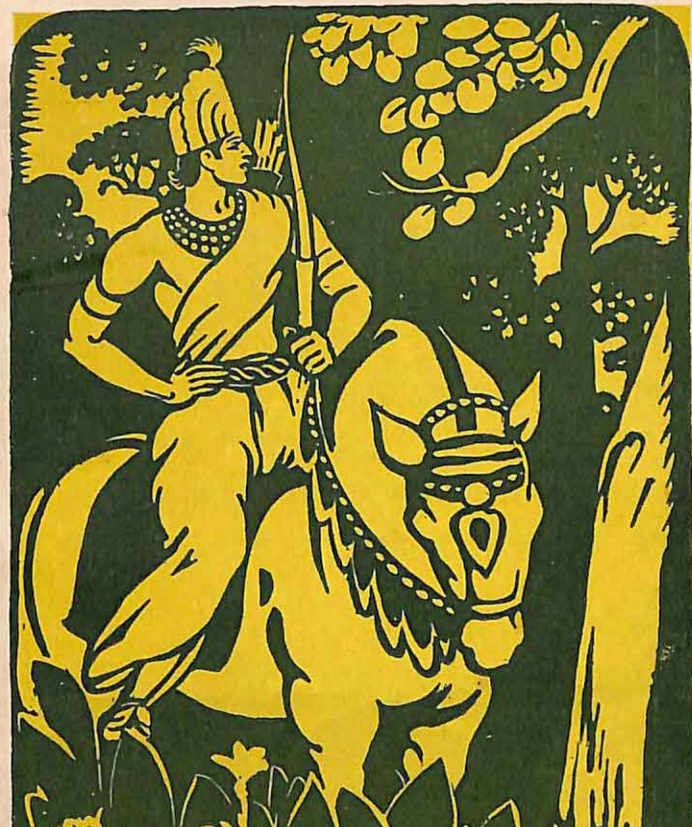
মৃগয়ার নামে মাধব্যের যেন জ্বর এল। গরিব ব্রাহ্মণ রাজবাড়িতে রাজার হালে থাকে, দুবেলা থাল-থাল লুচি মণ্ডা, ভার-ভার ক্ষীর দই দিয়ে মোটা পেট ঠাণ্ডা রাখে, মৃগয়ার নামে বেচারার মুখ এতটুকু হয়ে গেল, বাঘ ভালুকের ভয়ে প্রাণ কেঁপে উঠল।

'না' বলবার যো কি, রাজার আজ্ঞা!

অমনি হাতিশালে হাতি সাজল, ঘোড়াশালে ঘোড়া সাজল, কোমর বেঁধে পালোয়ান এল, বর্শা হাতে শিকারী এল, ধনুক হাতে ব্যাধ এল, জাল ঘাড়ে জেলে এল। তার-পর সারথি রাজার সোনার রথ নিয়ে এল, সিংহদ্বারে সোনার কপাট ঝন্‌ঝনা দিয়ে খুলে গেল।

রাজা সোনার রথে শিকারে চললেন।

দুপাশে দুই রাজহস্তী চামর ঢোলাতে ঢোলাতে চলল,



ছত্রধর রাজছত্র ধরে চলল, জয়ঢাক বাজতে বাজতে চলল, আর সর্বশেষে প্রিয়সখা মাধব্য এক খোঁড়া ঘোড়ায় হট্‌হট্‌ করে চললেন।

ক্রমে রাজা এ-বন সে-বন ঘুরে শেষে মহাবনে এসে পড়লেন। গাছে গাছে ব্যাধ ফাঁদ পাততে লাগল, খালে বিলে জেলে জাল ফেলতে লাগল, সৈন্য সামন্ত বন ঘিরতে লাগল—বনে সাড়া পড়ে গেল।

গাছে গাছে কত পাখি, কত পাখির ছানা পাতার ফাঁকে ফাঁকে কচি পাতার মতো ছোট ডানা নাড়ছিল, রাঙা ফলের মতো ডালে দুলছিল, আকাশে উড়ে যাচ্ছিল,



কোটরে ফিরে আসছিল, কিচমিচ করছিল। ব্যাধের সাড়া পেয়ে, বাসা ফেলে, কোটর ছেড়ে, কে কোথায় পালাতে লাগল।

মোষ গরমের দিনে ভিজে কাদায় পড়ে ঠাণ্ডা হচ্ছিল, তাড়া পেয়ে—শিং উঁচিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে গহন বনে পালাতে লাগল। হাতি শুঁড়ে করে জল ছিটিয়ে গা ধুচ্ছিল, শাল-গাছে গা ঘষছিল, গাছের ডাল ঘুরিয়ে মশা তাড়াচ্ছিল, ভয় পেয়ে—শুঁড় তুলে, পদ্মবন দলে, ব্যাধের জাল ছিঁড়ে পালাতে আরম্ভ করলে। বনে বাঘ হাঁকার দিয়ে উঠল, পর্বতে সিংহ গর্জন করে উঠল, সারা বন কেঁপে উঠল।



কত পাখি, কত বরা, কত বাঘ, কত ভালুক, কেউ জালে ধরা পড়ল, কেউ ফাঁদে বাঁধা পড়ল, কেউ বা তলোয়ারে কাটা গেল ; বনে হাহাকার পড়ে গেল। বনের বাঘ বন দিয়ে, জলের কুমির জল দিয়ে, আকাশের পাখি আকাশ ছেয়ে পালাতে আরম্ভ করলে।

ফাঁদ নিয়ে ব্যাধ পাখির সঙ্গে ছুটল, তীর নিয়ে বীর বাঘের সঙ্গে গেল, জাল ঘাড়ে জেলে মাছের সঙ্গে চলল রাজা সোনার রথে এক হরিণের সঙ্গে ছুটলেন। হরিণ প্রাণভয়ে হাওয়ার মতো রথের আগে দৌড়িয়েছে, সোনার রথ তার পিছনে বিদ্যুতের বেগে চলেছে। রাজার সৈন্য-



সামন্ত, হাতি, ঘোড়া, প্রিয়সখা মাধব্য, কতদূরে কোথায় পড়ে রইল। কেবল রাজার রথ আর বনের হরিণ নদীর ধারে দিয়ে, বনের ভিতর দিয়ে, মাঠের উপর দিয়ে ছুটে চলল।

যখন গহন বনে এই শিকার চলছিল তখন সেই তপোবনে সকলে নির্ভয়ে ছিল। গাছের ডালে টিয়াপাখি লাল ঠোঁটে ধান খুঁটছিল, নদীর জলে মনের সুখে হাঁস ভাসছিল, কুশবনে পোষা হরিণ নির্ভয়ে খেলা করছিল ; আর শকুন্তলা, অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা—তিন সখী কুঞ্জবনে গুন্-গুন্ গল্প করছিল।

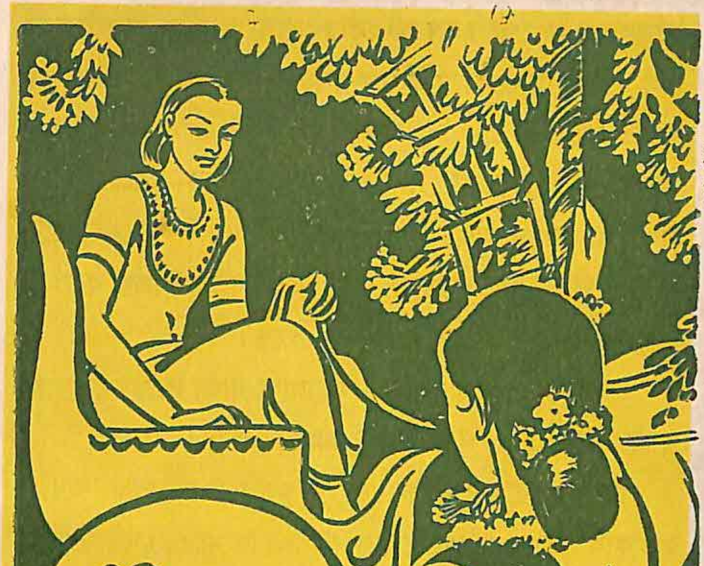
এই তপোবনে সকলে নির্ভয়, কেউ কারো হিংসা করে



না। মহাযোগী কণ্বের তপোবনে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। হরিণশিশু ও সিংহশাবক এক বনে খেলা করে। এ-বনে রাজাদেরও শিকার করা নিষেধ। রাজার শিকার—সেই হরিণ—ঊর্ধ্বশ্বাসে এই তপোবনের ভিতর চলে গেল। রাজাও অমনি ধনুঃশর ফেলে ঋষিদর্শনে চললেন।

সেই তপোবনে সোনার রথে পৃথিবীর রাজা, আর মাধবীকুঞ্জে রূপসী শকুন্তলা—দুজনে দেখা হল।

এদিকে মাধব্য কি বিপদেই পড়েছে! আর সে পারে না! রাজভোগ না হলে তার চলে না, নরম বিছানা ছাড়া ঘুম হয় না, পালকি ছাড়া সে এক পা চলে না, তার কি সারাদিন ঘোড়ার পিঠে চড়ে ‘ওই বরা যায়, ওই বাঘ পালায়’ করে এ-বন সে-বন ঘুরে বেড়ানো পোষায়? পল্বলের পাতা-পচা কষা জলে কি তার তৃষ্ণা ভাঙে? ঠিক সময়



রাজভোগ না পেলে সে অন্ধকার দেখে, তার কি সারাদিনের পর একটু আধপোড়া মাংসে পেট ভরে? পাতার বিছানায় মশার কামড়ে তার কি ঘুম হয়? বনে এসে ব্রাহ্মণ মহা মুশকিলে পড়েছে! সমস্ত দিন ঘোড়ার পিঠে ফিরে সর্বাঙ্গে দারুণ ব্যথা, মশার জ্বালায় রাত্রে নিদ্রা নেই, মনে সর্বদা ভয়—ওই ভালুক এল, ওই বুঝি বাঘে ধরলে! ভয়ে ভয়ে বেচারা আধখানা হয়ে গেছে।

রাজাকে কত বোঝাচ্ছে—'মহারাজ, রাজ্য ছারেখারে যায়, শরীর মাটি হল, আর কেন? রাজ্যে চলুন।'

রাজা তবু শুনলেন না, শকুন্তলাকে দেখে অবধি রাজকার্য ছেড়ে, মৃগয়া ছেড়ে, তপস্বীর মতো সেই তপোবনে রইলেন। রাজ্যে রাজার মা ব্রত করছেন, রাজাকে ডেকে পাঠালেন, তবু রাজ্যে ফিরলেন না, কত ওজর-আপত্তি করে মাধব্যকে সব সৈন্যসামন্ত সঙ্গে মা-র কাছে পাঠিয়ে দিয়ে একলা সেই তপোবনে রইলেন।

মাধব্য রাজবাড়িতে মনের আনন্দে রাজার হালে আছে, আর এদিকে পৃথিবীর রাজা বনবাসীর মতো বনে বনে

'হা শকুন্তলা! যো শকুন্তলা!' বলে ফিরছে। হাতের ধনুক, তূণের বাণ কোন বনে পড়ে আছে! রাজবেশ নদীর জলে ভেসে গেছে, সোনার অঙ্গ কালি হয়েছে, দেশের রাজা বনে ফিরছে।

আর শকুন্তলা কি করছে?—

নিকুঞ্জবনে পদ্মের বিছানায় বসে পদ্মপাতায় মহা-রাজাকে মনের কথা লিখছে। রাজাকে দেখে কে জানে তার মন কেমন হল! একদণ্ড না দেখলে প্রাণ কাঁদে, চোখের জলে বুক ভেসে যায়। দুই সখী তাকে পদ্মফুলে বাতাস করছে, গলা ধরে কত আদর করছে, আঁচলে চোখ মোছাচ্ছে, আর ভাবছে—এইবার ভোর হল, বুঝি সখীর রাজা ফিরে এল।

তারপর কি হল?

দুঃখের নিশি প্রভাত হল, মাধবীর পাতায় পাতায় ফুল ফুটল, নিকুঞ্জের গাছে গাছে পাখি ডাকল, সখীদের পোষা হরিণ কাছে এল।

আর কি হল?

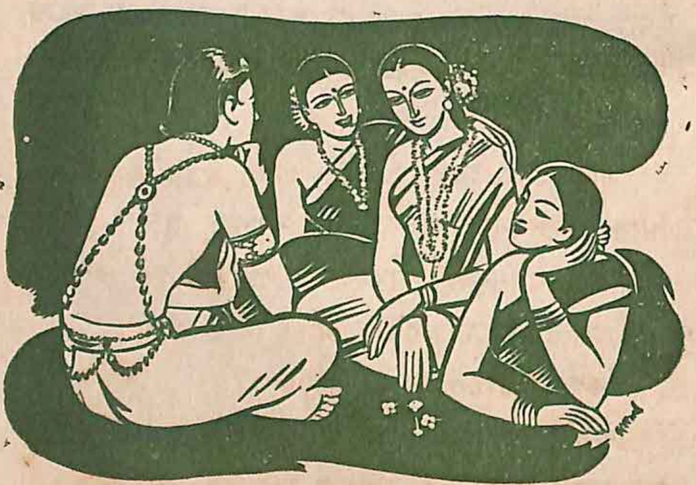
বনপথে রাজা-বর কুঞ্জে এল।

আর কি হল?

পৃথিবীর রাজা আর বনের শকুন্তলা—দুজনে মালা-বদল হল। দুই সখীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

তারপর কি হল?

তারপর কতদিন পরে সোনার সাঁঝে সোনার রথ রাজাকে নিয়ে রাজ্যে গেল, আর আঁধার বনপথে দুই প্রিয়-সখী শকুন্তলাকে নিয়ে ঘরে গেল।





তপোবনে

রাজা রাজ্যে চলে গেলেন, আর শকুন্তলা সেই বনে দিন গুনতে লাগল।

যাবার সময় রাজা নিজের মোহর আংটি শকুন্তলাকে দিয়ে গেলেন, বলে গেলেন—'সুন্দরী, তুমি প্রতিদিন আমার নামের একটি করে অক্ষর পড়বে, নামও শেষ হবে আর বনপথে সোনার রথ তোমাকে নিতে আসবে।'

কিন্তু হায়, সোনার রথ কই এল?

কতদিন গেল, কত রাত গেল; দুষ্মন্ত নাম কতবার পড়া হয়ে গেল, তবু সোনার রথ কই এল? হায় হায়,

সোনার সাঁঝে সোনার রথ সেই যে গেল আর ফিরল না!

পৃথিবীর রাজা সোনার সিংহাসনে, আর বনের রানী কুটির-দুয়ারে—দুজনে দুইখানে।

রাজার শোকে শকুন্তলার মন ভেঙে পড়ল। কোথা রইল অতিথি-সেবা, কোথা রইল পোষা হরিণ, কোথা রইল সাধের নিকুঞ্জবনে প্রাণের দুই প্রিয়সখী! শকুন্তলার মুখে হাসি নেই, চোখে ঘুম নেই! রাজার ভাবনা নিয়ে কুটির-দুয়ারে পাষাণ-প্রতিমা বসে রইল।

রাজার রথ কেন এল না?

কেন রাজা ভুলে রইলেন?

রাজা রাজ্যে গেলে একদিন শকুন্তলা কুটির-দুয়ারে গালে হাত দিয়ে বসে-বসে রাজার কথা ভাবছে—ভাবছে আর কাঁদছে, এমন সময় মহর্ষি দুর্বাসা দুয়ারে অতিথি

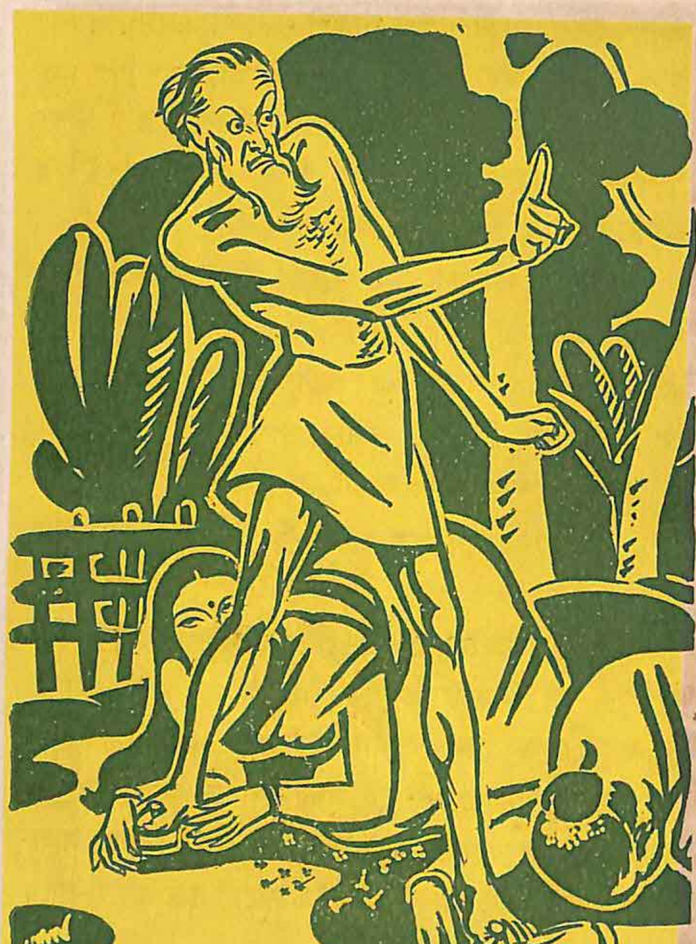
এলেন, শকুন্তলা জানতেও পারলে না, ফিরেও দেখলে না। একে দুর্বাসা মহা অভিমানী, একটুতেই মহা রাগ হয়, কথায়-কথায় যাকে-তাকে ভস্ম করে ফেলেন, তার উপর শকুন্তলার এই অনাদর—তাঁকে প্রণাম করলে না, বসতে আসন দিলে না, পা ধোবার জল দিলে না!

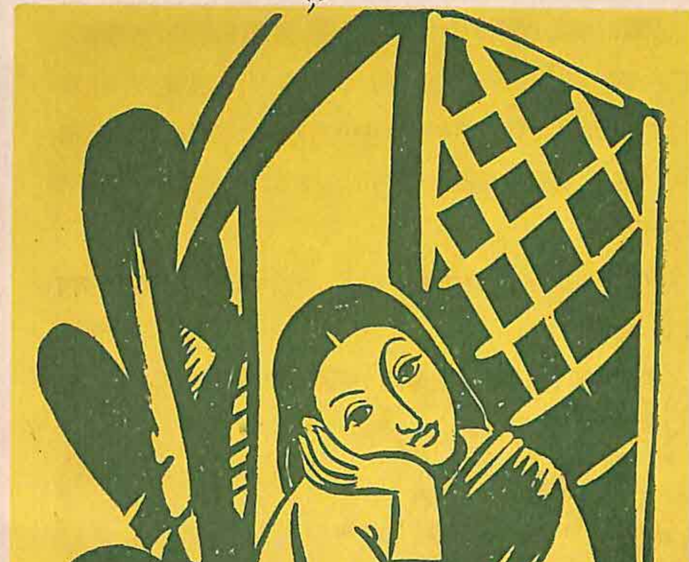
দুর্বাসার সর্বাঙ্গে যেন আগুন ছুটল, রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—'কী! অতিথির অপমান? পাপীয়সী, এই অভিসম্পাত করছি—যার জন্যে আমার অপমান করলি সে যেন তোকে কিছুতে না চিনতে পারে।'

হায়, শকুন্তলার কি তখন জ্ঞান ছিল—যে দেখবে কে এল, কে গেল! দুর্বাসার একটি কথাও তার কানে গেল না।

মহামানী মহর্ষি দুর্বাসা ঘোর অভিসম্পাত করে চলে গেলেন—সে কিছুই জানতে পারলে না, কুটির-দুয়ারে আনমনে যেমন ছিল তেমনি রইল।

অনসূয়া প্রিয়ম্বদা দুই সখী উপবনে ফুল তুলছিল, ছুটে এসে দুর্বাসার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। কত সাধ্য-সাধনা করে, কত কাকুতি-মিনতি করে, কত হাতে-পায়ে ধরে দুর্বাসাকে শান্ত করলে!





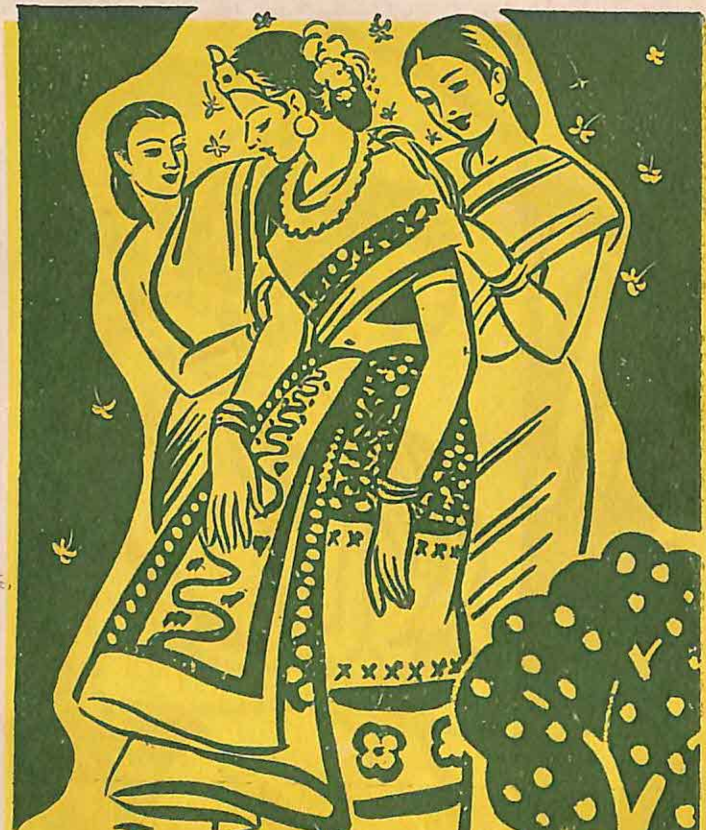
শেষে এই শাপান্ত হল—'রাজা যাবার সময় শকুন্তলাকে যে-আংটি দিয়ে গেছেন সেই আংটি যদি রাজাকে দেখাতে পারে তবেই রাজা শকুন্তলাকে চিনবেন; যতদিন সেই আংটি রাজার হাতে না-পড়বে ততদিন রাজা সব ভুলে থাকবেন।'

দুর্বাসার অভিশাপে তাই পৃথিবীর রাজা সব ভুলে রইলেন!

বনপথে সোনার রথ আর ফিরে এল না!

এদিকে দুর্বাসাও চলে গেলেন আর তাত কণ্বও তপোবনে ফিরে এলেন। সারা পৃথিবী খুঁজে শকুন্তলার বর মেলেনি। তিনি ফিরে এসে শুনলেন সারাপৃথিবীর রাজা বনে এসে তার গলায় মালা দিয়েছেন। তাত কণ্বের আনন্দের সীমা রইল না, তখনি শকুন্তলাকে রাজার কাছে পাঠাবার উদ্যোগ করতে লাগলেন। দুঃখে অভিমানে





শকুন্তলা মাটিতে মিশে ছিল, তাকে কত আদর করলেন, কত আশীর্বাদ করলেন।

উপবনে দুই সখী যখন শুনলে শকুন্তলা শ্বশুরবাড়ি চলল, তখন তাদের আর আহ্লাদের সীমা রইল না।

প্রিয়ম্বদা কেশর-ফুলের হার নিলে, অনসূয়া গন্ধ-ফুলের তেল নিলে; দুই সখীতে শকুন্তলাকে সাজাতে বসল। তার মাথায় তেল দিলে, খোঁপায় ফুল দিলে, কপালে সিঁদুর দিলে, পায়ে আল্‌তা দিলে, নতুন বাকল দিলে; তবু তো মন উঠল না! সখীর এ কি বেশ করে দিলে? প্রিয়সখী শকুন্তলা পৃথিবীর রানী, তার কি এই সাজ?—হাতে মৃণালের বালা, গলায় কেশরের মালা, খোঁপায় মল্লিকার ফুল, পরনে বাকল?—হায়, হায়, মতির মালা কোথায়? হীরের বালা কোথায়? সোনার মল কোথায়? পরনে শাড়ি কোথায়?

বনের দেবতারা সখীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন।

বনের গাছ থেকে সোনার শাড়ি উড়ে পড়ল, পায়ের মল বেজে পড়ল। বনদেবতারা পলকে বনবাসিনী শকুন্তলাকে রাজ্যেশ্বরী মহারানীর সাজে সাজিয়ে দিলেন।

তারপর যাবার সময় হল। হায়, যেতে কি পা সরে, মন কি চায়?

শকুন্তলা কোনদিকে যাবে—সোনার পুরীতে রানীর মতো রাজার কাছে চলে যাবে?—না, তিন সখীতে বনপথে আজন্মকালের তপোবনে ফিরে যাবে?

এদিকে শুভলগ্ন বয়ে যায়, ওদিকে বিদায় আর শেষ হয় না। কুঞ্জবনে মল্লিকা মাধবী কচি-কচি পাতা নেড়ে ফিরে ডাকছে, মা-হারা হরিণশিশু সোনার আঁচল ধরে বনের দিকে টানছে, প্রাণের দুই প্রিয়সখী গলা ধরে কাঁদছে। একদণ্ডে এত মায়া এত ভালোবাসা কাটানো কি সহজ?

মা-হারা হরিণশিশুকে তাত কণ্বের হাতে, প্রিয় তরু-লতাদের প্রিয়সখীদের হাতে সঁপে দিতে কত বেলাই হয়ে গেল।

তপোবনের শেষে বটগাছ, সেইখান থেকে তাত কণ্ব ফিরলেন!

দুই সখী কেঁদে ফিরে এল। আসবার সময় শকুন্তলার আঁচলে রাজার সেই আংটি বেঁধে দিলে, বলে দিলে—'দেখিস, ভাই, যত্ন করে রাখিস।'

তারপর বনের দেবতাদের প্রণাম করে, তাত কণ্বকে প্রণাম করে শকুন্তলা রাজপুরীর দিকে চলে গেল।

পরের মেয়ে পর হয়ে পরের দেশে চলে গেল—বন-খানা আঁধার করে গেল!

ঋষির অভিশাপ কখনো মিথ্যে হয় না। রাজপুরে যাবার পথে শকুন্তলা একদিন শচীতীর্থের জলে গা ধুতে গেল। সাঁতার-জলে গা ভাসিয়ে, নদীর জলে ঢেউ নাচিয়ে শকুন্তলা গা ধুলে। রঙ্গভরে অঙ্গের শাড়ি জলের উপর বিছিয়ে দিলে; জলের মতো চিকণ আঁচল জলের সঙ্গে মিশে গেল, ঢেউয়ের সঙ্গে গড়িয়ে গেল। সেই সময়ে দুর্বাসার শাপে রাজার সেই আংটি শকুন্তলার চিকণ আঁচলের এক কোণ থেকে অগাধ জলে পড়ে গেল, শকুন্তলা জানতেও পারলে না।

তারপর ভিজে কাপড়ে তীরে উঠে, কালো চুল এলো করে, হাসিমুখে শকুন্তলা বনের ভিতর দিয়ে রাজার কথা ভাবতে ভাবতে শূন্য আঁচল নিয়ে রাজপুরে চলে গেল, আংটির কথা মনেই পড়ল না।





রাজপুরে

দুর্বাসার শাপে রাজা শকুন্তলাকে একেবারে ভুলে বেশ সুখে আছেন। সাত ক্রোশ জুড়ে রাজার সাত মহল বাড়ি তার এক এক মহলে এক এক রকম কাজ চলছে।

প্রথম মহলে রাজসভা—সেখানে সোনার থামে সোনার ছাদ, তার তলায় সোনার সিংহাসন ; সেখানে দোষী-নির্দোষের বিচার চলছে।

তারপর দেবমন্দির—সেখানে সোনার দেয়ালে মানিকের পাখি, মুক্তোর ফল, পান্নার পাতা। মাঝখানে প্রকাণ্ড হোমকুণ্ড, সেখানে দিবারাত্রি হোম হচ্ছে। তারপর অতিথি-

শালা—সেখানে সোনার থালায় দুসন্ধ্যা লক্ষ লক্ষ অতিথি খাচ্ছে।

তারপর নৃত্যশালা—সেখানে নাচ চলেছে, শানের উপর সোনার নূপুর রুনুঝুনু বাজছে, স্ফটিকের দেয়ালে অঙ্গের ছায়া তালে তালে নাচছে।

সঙ্গীতশালায় গান চলছে, সোনার পালঙ্কে পৃথিবীর রাজা রাজা-দুষ্মন্ত বসে আছেন, দক্ষিণ-দুয়ারি ঘরে দক্ষিণের বাতাস আসছে; শকুন্তলার কথা তাঁর মনেই নেই। হায়, দুর্বাসার শাপে, সুখের অন্তঃপুরে সোনার পালঙ্কে রাজা সব ভুলে রইলেন।

আর শকুন্তলা কত ঝড়-বৃষ্টিতে, কত পথ চলে, রাজার কাছে এল, রাজা চিনতেও পারলেন না; বললেন—'কন্যে, তুমি কেন এসেছ? কি চাও? টাকা-কড়ি চাও, না, ঘর-বাড়ি চাও? কি চাও?'

শকুন্তলা বললে—'মহারাজ, আমি টাকা চাই না, কড়িও চাই না, ঘর-বাড়ি কিছুই চাই না, আমি চাই তোমায়। তুমি আমার রাজা, আমার গলায় মালা দিয়েছ, আমি তোমায় চাই।'





রাজা বললেন—'ছি ছি, কন্যে, এ কি কথা! তুমি হলে বনবাসিনী তপস্বিনী, আমি হলেম রাজ্যেশ্বর মহারাজা, আমি তোমায় কেন মালা দেব? টাকা চাও টাকা নাও, ঘর-বাড়ি চাও তাই নাও, গায়ের গহনা চাও তাও নাও। রাজ্যেশ্বরী হতে চাও—এ কেমন কথা?'

রাজার কথায় শকুন্তলার প্রাণ কেঁপে উঠল, কাঁদতে কাঁদতে বললে—'মহারাজ, সে কি কথা! আমি যে সেই শকুন্তলা—আমায় ভুলে গেলে? মনে নেই, মহারাজ, সেই মাধবীর বনে একদিন আমরা তিন সখীতে গুন্‌গুন্‌ গল্প করছিলুম, এমন সময় তুমি অতিথি এলে; সখীরা তোমায় পা-ধোবার জল দিলে, আমি আঁচলে ফল এনে দিলেম, তুমি হাসিমুখে তাই খেলে। তারপর একটা পদ্ম-পাতায় জল নিয়ে আমার হরিণশিশুকে খাওয়াতে গেলে, সে ছুটে পালাল, তুমি কত ডাকলে, কত মিষ্টি কথা বললে কিছুতে এল না। তারপর আমি ডাকতেই আমার কাছে এল আমার হাতে জল খেল, তুমি আদর করে বললে—দুইজনেই বনের প্রাণী কিনা তাই এত ভাব!—শুনে সখীরা হেসে উঠল, আমি লজ্জায় মরে গেলাম। তারপর, মহারাজ, তুমি কতদিন তপস্বীর মতো সে বনে রইলে।

বনের ফল খেয়ে, নদীর জল খেয়ে কতদিন কাটালে। তার-পর একদিন পূর্ণিমা রাতে মালিনীর তীরে নিকুঞ্জ বনে আমার কাছে এলে, আমার গলায় মালা দিলে—মহারাজ, সে-কথা কি ভুলে গেলে?'

'যাবার সময় তুমি মহারাজ, আমার হাতে তোমার আংটি পরিয়ে দিলে; প্রতিদিন তোমার নামের একটি করে অক্ষর পড়তে বলে দিলে, বলে গেলে—নামও শেষ হবে আর আমায় নিতে সোনার রথ পাঠাবে। কিন্তু মহারাজ, সোনার রথ কই পাঠালে, সব ভুলে রইলে? মহারাজ, এমনি করে কি কথা রাখলে?'

বনবাসিনী শকুন্তলা রাজার কাছে কত অভিমান করলে, রাজাকে কত অনুযোগ করলে, সেই কুঞ্জবনের কথা, সেই দুই সখীর কথা, সেই হরিণশিশুর কথা—কত কথাই মনে করিয়ে দিলে, তবু রাজার মনে পড়ল না। শেষে রাজা বললেন—'কই, কন্যা, দেখি তোমার সেই আংটি? তুমি যে বললে আমি তোমায় আংটি দিয়েছি, কই দেখাও দেখি কেমন আংটি?'

শকুন্তলা তাড়াতাড়ি আঁচল খুলে আংটি দেখাতে গেল, কিন্তু হায়, আঁচল শূন্য!

রাজার সেই সাতরাজার ধন এক মানিকের বরণ-আংটি কোথায় গেল!

এতদিনে দুর্বাসার শাপ ফলল। হায়, রাজাও তার পর হলেন, পৃথিবীতে আপনার লোক কেউ রইল না!

'মা-গো!'—বলে শকুন্তলা রাজসভায় শানের উপর ঘুরে পড়ল; তার কপাল ফুটে রক্ত ছুটল, রাজসভায় হাহাকার পড়ে গেল!

সেই সময় শকুন্তলার সেই পাষাণী মা মেনকা স্বর্গ-পুরে ইন্দ্রসভায় বীণা বাজিয়ে গান গাইছিল। হঠাৎ তার বীণার তার ছিঁড়ে গেল, গানের সুর হারিয়ে গেল, শকুন্তলার জন্যে প্রাণ কেঁদে উঠল, অমনি সে বিদ্যুতের মতো মেঘের রথে এসে রাজার সভা থেকে শকুন্তলাকে কোলে তুলে একেবারে হেমকূট পর্বতে নিয়ে গেল।

সেই হেমকূট পর্বতে কশ্যপের আশ্রমে স্বর্গের অপ্সরাদের মাঝে কতদিনে শকুন্তলার একটি রাজচক্রবর্তী রাজকুমার হল।

সেই কোল-ভরা ছেলে পেয়ে শকুন্তলার বুক জুড়ল।



শকুন্তলা তো চলে গেল। এদিকে রাজবাড়ির জেলেরা একদিন শচীতীর্থের জলে জাল ফেলতে আরম্ভ করলে। রুপোলি রঙের সরলপুঁটি, চাঁদের মতো পায়রা-চাঁদা, সাপের মতো বাণমাছ, দাড়াওয়ালা চিংড়ি, কাঁটা-ভরা বাটা কত কি জালে পড়ল। সোনালি রুপোলি মাছে নদীর পাড় মাছের ঝুড়ি যেন সোনায় রুপোয় ভরে গেল। সারা-দিন জেলেদের জালে কত রকমের কত যে মাছ পড়ল তার আর ঠিকানা নেই। শেষে ক্রমে বেলা পড়ে এল ; নীল আকাশ, নদীর জল, নগরের পথ আঁধার হয়ে এল ; জাল গুটিয়ে জেলেরা ঘরে চলল।

এমন সময় এক জেলে জাল ঘাড়ে নদীতীরে দেখা দিল। প্রকাণ্ড জালখানা মাথার উপর ঘুরিয়ে নদীর উপর উড়িয়ে দিলে ; মেঘের মতো কালো জাল আকাশে ঘুরে, নদীর এ-পার ওপার দু-পার জুড়ে জলে পড়ল। সেই সময় মাছের সর্দার, নদীর রাজা, বুড়ো মাছ রুই অন্ধকারে সন্ধ্যার সময় সেই নদী-ঘেরা কালো জালে ধরা পড়ল। জেলে পাড়ায় রব উঠল—জাল কাটবার গুরু, মাছের সর্দার, বুড়ো রুই এতদিনে জালে পড়েছে। যে যেখানে ছিল নদীতীরে ছুটে এল। তারপর অনেক কষ্টে

মাছ ডাঙায় উঠল। এত বড় মাছ কেউ কখনো দেখেনি। আবার যখন সেই মাছের পেট চিরতে সাতরাজার ধন এক মানিকের আংটি জ্বলন্ত আগুনের মতো ঠিক্‌রে পড়ল তখন সবাই অবাক হয়ে রইল। যার মাছ তার আনন্দের সীমা রইল না।

গরীব জেলে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলে। মাছের ঝুড়ি, ছেঁড়া জাল জলে ফেলে মানিকের আংটি সেকরার দোকানে বেচতে চলল। রাজা শকুন্তলাকে যে-আংটি দিয়েছিলেন—এ সেই আংটি। শচীতীর্থে গা-ধোবার সময় তার আঁচল থেকে যখন জলে পড়ে যায় তখন রুইমাছটা খাবার ভেবে গিলে ফেলেছিল।

জেলের হাতে রাজার মোহর আংটি দেখে সেকরা কোটালকে খবর দিলে। কোটাল জেলেকে মারতে-মারতে রাজসভায় হাজির করলে। বেচারা জেলে রাজদরবারে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে কেমন করে মাছের পেটে আংটি পেয়েছে নিবেদন করলে।

রাজমন্ত্রী দেখলেন সত্যিই আংটিতে মাছের গন্ধ। জেলে ছাড়া পেয়ে মোহরের তোড়া বখশিশ নিয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি গেল।



এদিকে আংটি হাতে পড়তেই রাজার তপোবনের কথা সব মনে পড়ে গেল।

শকুন্তলার শোকে রাজা যেন পাগল হয়ে উঠলেন। বিনা দোষে তাকে দূর করে দিয়ে প্রাণ যেন তুষের আগুনে পুড়তে লাগল। মুখে অন্য কথা নেই, কেবল—'হা শকু-ন্তলা!—হা শকুন্তলা!'

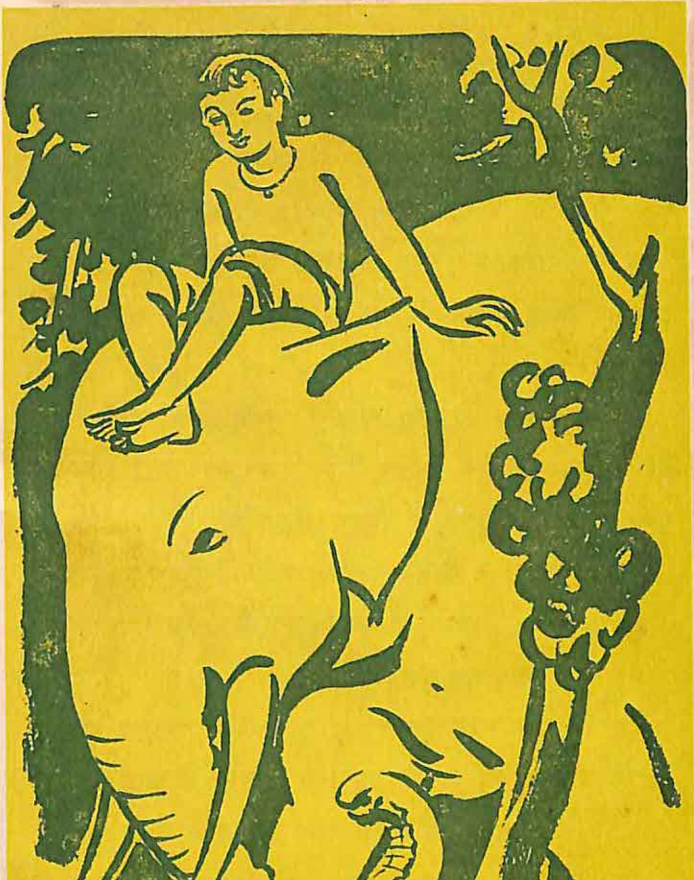
আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, কিছুতে সুখ নেই; রাজকার্যে সুখ নেই, অন্তঃপুরে সুখ নেই, উপবনে সুখ নেই—কোথাও সুখ নেই।

সঙ্গীতশালায় গান বন্ধ হল, নৃত্যশালায় নাচ বন্ধ হল, উপবনে উৎসব বন্ধ হল।

রাজার দুঃখের সীমা রইল না।

একদিকে বনবাসিনী শকুন্তলা কোলভরা ছেলে নিয়ে হেমকূটের সোনার শিখরে বসে রইল, আর একদিকে জগতের রাজা, রাজা-দুষ্মন্ত জগৎজোড়া শোক নিয়ে ধূলায় ধূসর পড়ে রইলেন।

কতদিন পরে দেবতার কৃপা হল।



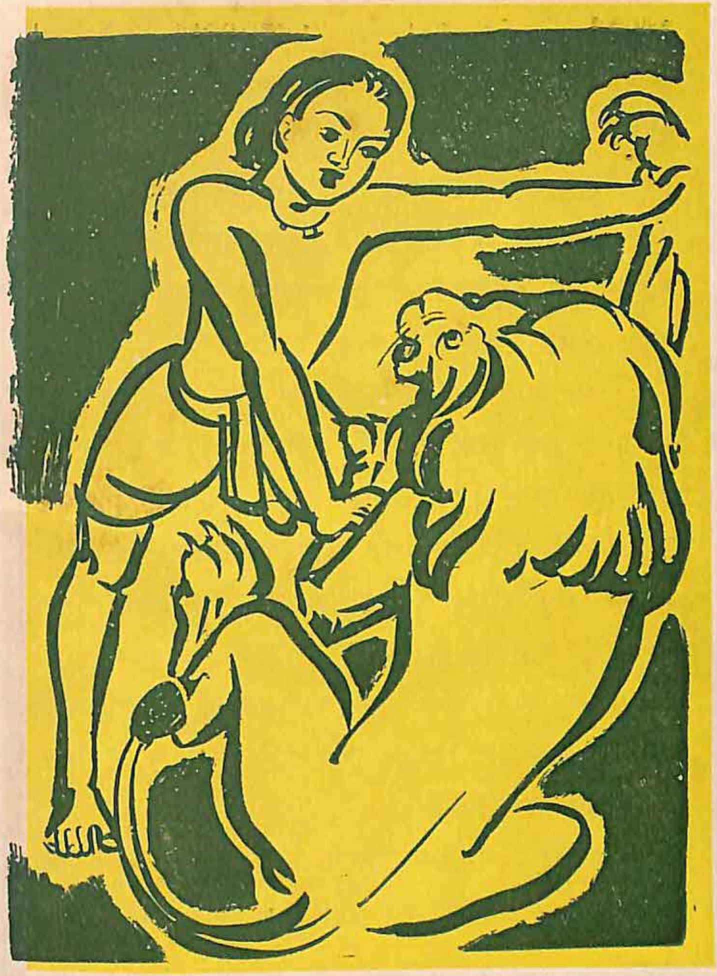
স্বর্গ থেকে ইন্দ্রদেবের রথ এসে রাজাকে দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে স্বর্গপুরে নিয়ে গেল। সেখানে নন্দনবনে কত দিন কাটিয়ে দৈত্যদের সঙ্গে কত যুদ্ধ করে, মন্দারের মালা গলায় পরে, রাজা রাজ্যে ফিরছেন—এমন সময় দেখলেন, পথে হেমকূট পর্বত, মহর্ষি কশ্যপের আশ্রম। রাজা মহর্ষিকে প্রণাম করবার জন্য সেই আশ্রমে চললেন।

এই আশ্রমে অনেক তাপস, অনেক তপস্বিনী থাকতেন, অনেক অপ্সর, অনেক অপ্সরা থাকত। আর থাকত—শকুন্তলা আর তার পুত্র রাজপুত্র সর্বদমন।

রাজা দুষ্মন্ত যেমন দেশের রাজা ছিলেন তাঁর সেই রাজপুত্র তেমনি বনের রাজা ছিল। বনের যত জীবজন্তু তাকে বড়ই ভালোবাসত।

সেই বনে সাত ক্রোশ জুড়ে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল, তার তলায় একটা প্রকাণ্ড অজগর দিনরাত্রি পড়ে থাকত। এই গাছতলায় সর্বদমনের রাজসভা বসত।

হাতিরা তাকে মাথায় করে নদীতে নিয়ে যেত, শুঁড়ে করে জল ছিটিয়ে গা ধুইয়ে দিত, তারপর তাকে সেই সাপের পিঠে বসিয়ে দিত—এই তার রাজসিংহাসন।

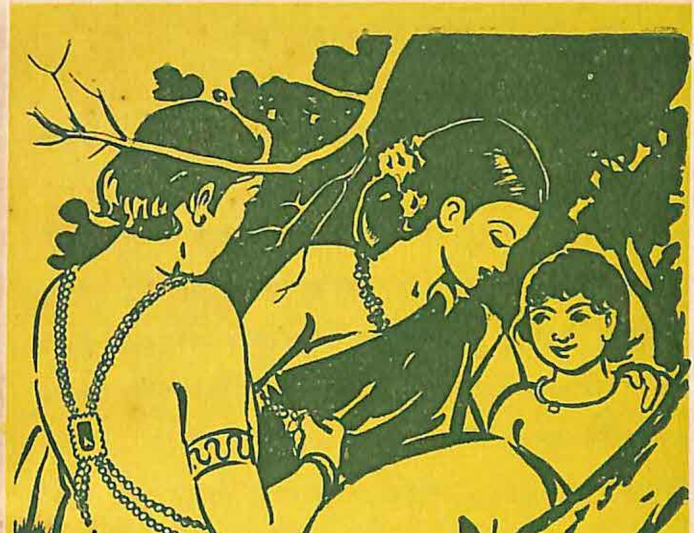


দুদিকে দুই হাতি পদ্মফুলের চামর দোলাত, অজগর ফণা মেলে মাথায় ছাতা ধরত। ভালুক ছিল মন্ত্রী, সিংহ ছিল সেনাপতি, বাঘ চৌকিদার, শেয়াল ছিল কোটাল ; আর ছিল—শুক-পাখি তার প্রিয়সখা, কত মজার মজার কথা বলত, দেশ-বিদেশের গল্প করত। সে পাখির বাসায় পাখির ছানা নিয়ে খেলা করত, বাঘের বাসায় বাঘের কাছে বসে থাকত—কেউ তাকে কিছু বলত না। সবাই তাকে ভয়ও করত, ভালোও বাসত।

রাজা যখন সেই বনে এলেন তখন রাজপুত্র একটা সিংহশিশুকে নিয়ে খেলা করছিল, তার মুখে হাত পুরে দাঁত গুনছিল, তাকে কোলে পিঠে করছিল, তার জটা ধরে টানছিল। বনের তপস্বিনীরা কত ছেড়ে দিতে বলছিলেন, কত মাটির ময়ূরের লোভ দেখাচ্ছিলেন, শিশু কিছুতেই শুনছিল না।

এমন সময় রাজা সেখানে এলেন, সিংহশিশুকে ছাড়িয়ে সেই রাজশিশুকে কোলে নিলেন ; দুষ্টু শিশু রাজার কোলে শান্ত হল।

সেই রাজশিশুকে কোলে করে রাজার বুক যেন জুড়িয়ে গেল। রাজা তো জানেন না যে এ শিশু তাঁরই



পুত্র। ভাবছেন—পরের ছেলেকে কোলে করে মন কেন এমন হল, এর উপর কেন এত মায়া হল?

এমন সময় শকুন্তলা অঞ্চলের নিধি কোলের বাছাকে খুঁজতে খুঁজতে সেইখানে এলেন।

রাজারানীতে দেখা হল, রাজা আবার শকুন্তলাকে আদর করলেন, তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন। দেবতার কৃপায় এতদিনে আবার মিলন হল, দুর্বাসার শাপান্ত হল। কশ্যপ অদিতিকে প্রণাম করে রাজারানী রাজপুত্র কোলে রাজ্যে ফিরলেন।

তারপর কতদিন সুখে রাজত্ব করে, রাজপুত্রকে রাজ্য দিয়ে, রাজারানী সেই তপোবনে তাত কণ্বের কাছে সেই দুই সখীর কাছে, সেই হরিণশিশুর কাছে, সেই সহকার এবং মাধবীলতার কাছে ফিরে গেলেন এবং তাপস তাপসীদের সঙ্গে সুখে জীবন কাটিয়ে দিলেন।



মহাভারতের যে অমর কাহিনী নিয়ে কালিদাস তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক রচনা করেছিলেন, সেই দুষ্মন্ত-শকুন্তলার গল্প—ছোটদের জন্য ছোট করে বলেছেন অবনীন্দ্রনাথ। 'শকুন্তলা'য় সেকালের রাজারানী, ছেলেমেয়ে, মুনিঋষি, বন-তপোবন তাঁর বলার গুণে স্বচ্ছ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। যেন ছোট পুকুরের কাকচক্ষু জলে পড়েছে বিরাট আকাশের ছায়া। বইখানির গঠনসজ্জাও বিচিত্র, ছোটদের মুগ্ধ করার মতো পাতায় পাতায় ছবি। এঁকেছেন মাখন দত্তগুপ্ত।